দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা -- বালকবৎ -- উন্মাদবৎ

ঠাকুর বারান্দার দিকে একটু গিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। বাহিরে যাইবার সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরের কন্যা তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিল, তাহার বয়স ৬/৭ বৎসর হইবে। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলে পর মেয়েটি তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আরও দু-একটি সমবয়স্ক ছেলেমেয়ে আছে।

বিশ্বম্ভরের কন্যা (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) -- আমি তোমায় নমস্কার করলুম, দেখলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- কই, দেখি নাই।

কন্যা -- তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার করি; -- দাঁড়াও, এ পা'টা করি!

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন ও ভূমি পর্যন্ত মস্তক নত করিয়া কুমারীকে প্রতিনমস্কার করিলেন। ঠাকুর মেয়েটিকে গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েটি বলিল -- "মাইরি, গান জানি না!"

তাহাকে আবার অনুরোধ করাতে বলিতেছে, "মাইরি বললে আর বলা হয়?" ঠাকুর তাহাদের লইয়া আনন্দ করিতেছেন ও গান শুনাইতেছেন। প্রথমে কেলুয়ার গান, তারপর, "আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দি, তোর ভাতার এলে বলবে কি!" (ছেলেরা ও ভক্তেরা গান শুনিয়া হাসিতেছেন)

[*পূর্বকথা -- জন্মভূমিদর্শন*[1] *-- বালক শিবরামের চরিত্র -- সিওড়ে হৃদয়ের বাড়ি দুর্গাপূজা -- ঠাকুরের উন্মাদকালে লিঙ্গপূজা*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) -- পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মতো। সব চৈতন্যময় দেখে।

"যখন আমি ও-দেশে (কামারপুকুরে), রামলালের ভাই (শিবরাম) তখন ৪/৫ বছর বয়স, -- পুকুরের ধারে ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। পাতা নড়ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বলছে 'চোপ্! আমি ফড়িং ধরব!' ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতরে সে আছে; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গেল না, উঁকি মেরে মেরে এক-একবার দেখছে, বিদ্যুৎ, -- আর বলছে, 'খুড়ো! আবার চকমকি ঠুকছে'।

"পরমহংস বালকের ন্যায় -- আত্মপর নাই, ঐহিক সম্বন্ধের আঁট নাই। রামলালের ভাই একদিন বলছে, 'তুমি খুড়ো না পিসে?'

"পরমহংসের বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রহ্মময় দেখে -- কোথায় যাচ্ছে -- কোথায় চলছে -- হিসাব নাই। রামলালের ভাই হৃদের বাড়ি দুর্গাপূজা দেখতে গিছিল। হৃদের বাড়ি থেকে ছটকে আপনা-আপনি

---

[1] শ্রীযুক্ত শিবরামের জন্ম -- ১৮ই চৈত্র, ১২৭২, দোলপূর্ণিমার দিনে (৩০শে মার্চ, ১৮৬৬ খ্রী:) ঠাকুরের এবার জন্মভূমিদর্শনের সময় তিন-চার বছর বয়স অর্থাৎ ১৮৬৯-৭০ খ্রী:।

কোন্‌ দিকে চলে গেছে! চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাসা করছে, তুই কোথা থেকে এলি? তা কিছু বলতে পারে না। কেবল বললে – ‘চালা’ (অর্থাৎ যে আটচালায় পূজা হয়েছে)। যখন জিজ্ঞাসা করলে, ‘কার বাড়ি থেকে এসেছিস?’ তখন কেবল – ‘দাদা’।

“পরমহংসের আবার উন্মাদের অবস্থা হয়। যখন উন্মাদ হল, শিবলিঙ্গ বোধে নিজের লিঙ্গ পূজা করতাম। জীবন্ত লিঙ্গপূজা। একটা আবার মুক্তা পরানো হত! এখন আর পারি না।”

[*প্রতিষ্ঠার পর (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৫) পূর্ণজ্ঞানী পাগলের সঙ্গে দেখা*]

“দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসেছিল, -- পূর্ণজ্ঞানী। ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি -- একহাতে একটি ভাঁড়, আঁবচারা; গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোন সন্ধ্যা আহ্নিক নাই, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেলে। তারপর কালীঘরে গিয়ে স্তব করতে লাগল। মন্দির কেঁপে গিয়েছিল! হলধারী তখন কালীঘরে ছিল। অতিথিশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই -- তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল -- যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলিকে সরিয়ে নিজে খেতে লাগল, -- তা কুকুরগুলো কিছু বলে নাই। হলধারী পেছু পেছু গিয়েছিল, আর জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘তুমি কে? তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী?’ তখন সে বলেছিল, ‘আমি পূর্ণজ্ঞানী! চুপ!’

“আমি হলধারীর কাছে যখন এ-সব কথা শুনলাম আমার বুক গুর গুর করতে লাগল, আর হৃদেকে জড়িয়ে ধরলুম। মাকে বললাম, ‘মা, তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে!’ আমরা দেখতে গেলাম -- আমাদের কাছে খুব জ্ঞানের কথা -- অন্য লোক এলে পাগলামি। যখন চলে গেল, হলধারী অনেকখানি সঙ্গে গিয়েছিল। ফটক পার হলে হলধারীকে বলেছিল ‘তোকে আর কি বলব। এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে যখন কোন ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখন জানবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।’ তারপর বেশ হনহন করে চলে গেল।”